The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.115 -122)
Published in October, 2025

সেলিম আল দীনকৃত নাটক: লড়াকু ও ক্ষয়িষ্ণু নারীর আখ্যান

শাকিলা তাসমিন *

প্রতিপাদ্যসার: সেলিম আল দীন (১৯৪৮-২০০৮) রচিত নাটকে চরিত্র নির্মাণ, কাহিনির বয়ান প্রভৃতিতে উঠে এসেছে বাঙালির শিকড় মথিত শিল্প চেতনা। আমাদের সমাজের ক্ষয়িষ্ণু একেবারে অন্ন গৃহহীন মানুষের জীবনাচার প্রতিফলিত– হয়েছে বিচিত্রতর ব্যঞ্জনায়। এই ধারায় প্রত্যেক নাটকে নারী চরিত্র সমূহ প্রধানতর ভূমিকায় অর্বতীন হয়েছে। নাটকে উপস্থাপিত প্রত্যেকটি নারী চরিত্র অবহেলিত, সামাজিকভাবে ধিকৃত ফলশ্রুতিতে চরিত্রসমূহ সামাজিক, পারিবারিক কিংবা পারিপার্শ্বিক যাতনা সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়েছে কিংবা কেউ কেউ প্রতিবাদী ও প্রতিরোধের ভূমিকায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেয়ে পিছু হটেছে। মূলত সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নিগৃহীত লড়াকু ও ক্ষয়িষ্ণু নারী চরিত্রের স্বরূপ তুলে ধরা আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

সেলিম আল দীন রচিত প্রথম দিকের নাটক বাসন (১৯৮৫)। এই নাটকে দেখা যায় একটি বাসন ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে একটি কৃষক পরিবার গভীর ভালোবাসায় আগলে রেখেছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সাহসী যোদ্ধা ছদরুদ্দীন, তিনি এই বাসনে খেতেন তাই চার পুরুষ ধরে এই বাসন আগলে রাখা হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ গ্রামে এক নব্য রাজনীতিবিদ এসে তার স্ট্যাটাস উচ্চপদে থাকা নেতাদের সামনে তুলে ধরবেন বলে সেটি হস্তগত করতে তৎপর হয়। কিন্তু এই কৃষক পরিবার রাজনীতিবিদের প্রভাব প্রতাপের নিকট নত হয়না। কিন্তু হঠাৎ কৈতরী চরিত্রের পণের টাকা জোগানের প্রসঙ্গ টি সামনে এলে তারা কিছু টাকার বিনিময়ে নেতাকে বাসনটি প্রদানে সম্মতি প্রকাশ করে। মূলত নাট্যের অন্যতম চরিত্র কৈতরীর শ্বশুর বাড়ীতে যৌতুকের জন্যে নির্যাতন প্রায় নিত্যদিনের বিষয় ছিল। তার শ্বশুর এক হাজার টাকার পণ উসুলে কৈতরীকে পিতৃগৃহে রেখে আসে। কৈতরীর নির্যাতনের চিত্র এভাবে নাটকে বিবৃত হয়- কৈতরী: এই দেহ এই দ্যাহ বাই আমার পিঠডা। হে তারা এক বছরে কি করে নাই আমারে (আল দীন, *বাসন* ২২)। কৈতরী ছোট বেলায় মা হারিয়ে পিতৃগৃহে একবেলা খাবার জোটে তো অন্য বেলা উপোস জীবনযাপন করে। পরবর্তীতে একটু সুখ, ভালোবাসা, দু'বেলা দুমুঠো ভাতের নিশ্চয়তায় পিতৃগৃহ ছেড়ে বিবাহ সূত্রে গিয়েছিল স্বামীর নিশ্চিত আবাসে। কিন্তু সেখানে স্বামী সুখ কিংবা ক্ষুধা নিবারণ কোনটি তাকে আত্মতৃপ্ত করেনি। শ্বশুরালয়ের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে কৈতরী স্বামীর বিদেশ গমনের এবং যৌতুকের টাকা সংগ্রহে পুনরায় পিতার কাছে ফিরে আসে। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হয়নি তাদের চাওয়ার পূর্ণতা দানে। শেষাবধি পরিবারের ঐতিহ্য 'বাসন' এর বিনিময়ে পণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার বাবা। কৈতরী বিষয়টি আঁচ করতে পারে কিন্তু তার মনে হয় পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য বাসন রক্ষাই তার একমাত্র প্রতিজ্ঞা। তাই সে বলে "কৈতরী": বাজান-আমার জান যাইতে পারে-কিন্তুক তও বাসন আমি বেচতে দিমু না। এই বাসন যুদি বেইচা দেও তাইলে গুনা অইবো গজব পড়বো (আল দীন, *বাসন* ৩১)। পারিবারিক দৈন্যতা, সামাজিক অবজ্ঞা, অপমান, অপয়া- অপবাদ সকল কিছুকে উপেক্ষা করে বিষপানে অনন্তের পথে ধাবিত হয় কৈতরী।

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

পরবর্তী **কিত্তনখোলা** নাটকে (১৯৭৮-৮০) বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি ছায়া সুশীতল সুনিবিড় গ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। মূলত এই গ্রামের একটি মাঘী মেলাকে কেন্দ্র করে নাটকটির বৃহত্তর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। শুধু বৃহত্তর কাহিনি নয়, এর অঙ্গ-উপাঙ্গ বিস্তার লাভ করেছে বাংলার ঐতিহ্য সংস্কৃতি নানা পেশার মানুষের জীবন জীবিকা কিংবা এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনাচারের কাহিনি ও কাহিনির গতি সঞ্চারে অধিষ্ঠিত হয়েছে অজস্র চরিত্র। কিত্তনখোলা নাটকে নাট্যকার অগণিত মানুষের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার মধ্যে রয়েছে-

১) যাত্রা দল ২) গ্রামের মানুষ ৩) মেলায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ৪) গ্রামের অসহায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ৫) লাউয়া সম্প্রদায় ৬) মহাজন ৭) চাষী, দিনমজুরসহ অজস্র মানুষের সমাগম।

এছাড়া মেলায় আগত স্বল্প পুঁজির মানুষেরা যারা বাংলার ঐতিহ্য বহনকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। নাট্য কাহিনির স্তরে স্তরে বিবৃত হয়েছে একটি ভূখন্ডের ক্ষয়ে যাওয়ার বেদনা, নিরন্তর বয়ে চলা দুঃখ-কষ্ট, মনোগত সংঙ্কট কিংবা শারীরিক যন্ত্রণা পাশ কাটিয়ে একটি সংসার আগলে রাখা বা সঠিক জীবনের পথ হারিয়ে ফেলা কিংবা হাতড়ে ফেরা মানুষের জীবনালেখ্য। যেখানে প্রেম-ভালোবাসা জৈবিক চাহিদার নিত্যবাস, সবারই স্বপ্ন স্বামী সংসার সন্তানকে আঁকড়ে থাকার বাসনা। আলোচ্য ক্ষয়িষ্ণু লড়াকু নারী প্রসঙ্গে কিত্তনখোলা নাটকের প্রধান দুই নারীর চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতায় বনশ্রী ও ডালিমন উল্লেখযোগ্য। কিত্তনখোলা নাটকে দুই ধারার নাট্য চরিত্রের আভাস মেলে প্রথমত সোনাই, ছায়ারঞ্জন, বছির, বনশ্রী ও ডালিমন ক্ষয়িষ্ণু লড়াকু নারী অন্তর্ভুক্ত চরিত্র। অন্যদিকে সামাজিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে ইদু কনটাকটর চরিত্রটি। কিত্তনখোলা লৌহজং নদীর ধারে প্রতি পূর্ণিমায় তিন দিনের মেলা বসে। নাটকের উল্লেখযোগ্য বিষয় লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি, মেলার মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রেম-ভালোবাসা-সংঘাত-পরিণয়-পরিণতি-বিরহ, যাত্রাদল, গাজীর গানের দল, মদ খেয়ে বুঁদ হওয়া প্রভৃতি চিত্র। কিত্তনখোলা নাটকে নয়টি সর্গের দ্বিতীয় সর্গে বনশ্রীবালা চরিত্রটির আত্মপ্রকাশ। বনশ্রী সেখানে যাত্রা দলের নর্তকী, নাচ দেখিয়ে মনোরঞ্জন করা তার মূল জীবিকা। নাট্যে বনশ্রী চরিত্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক মানদন্ডে, নিম্নশ্রেণীর অধিভুক্ত কোনভাবে বেঁচে থাকার লড়াই তার নিত্যদিনের চিত্র।

কিত্তনখোলা বনশ্রীর জীবনের দুই দিক উন্মোচিত হয় প্রথমত বেশ্যাবৃত্তি, দ্বিতীয়ত যাত্রা পালার শিল্পী। শুধু তা নয় পরিণত বয়সে নিত্যদিন পুরুষের দেহ-জৈবিক লালসার শিকার হতে হয়। এমনতর জীবন ধারার নারী বনশ্রীকে আত্মপীড়িত ও বিবেকের কাছে দংশিত করে প্রতিনিয়ত। কিশোরী বনশ্রী বাবাকে হারিয়ে ধরাশায়ী হয় সুবল ঘোষের কাছে, প্রায় প্রতিরাতে সুবল তার শরীরে বিষাক্ত দংশন করতো তখন বনশ্রীর আত্ম চীৎকার ধ্বণিত হতো, আত্মতৃপ্ত নয় সে আতঙ্কিত ও পীড়ন যন্ত্রণায় ছটফট করতো। বনশ্রী পিতৃগহে নিগৃহীত হয়ে পতিতার জীবন বরণ করে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায়। নিরুপায় এই জীবন তার প্রত্যাশিত ছিল না তাই সে পতিতাবৃত্তি ছেড়ে যাত্রাদলে অভিনয়ের জন্য নিজেকে নিবেদিত করে।' বনশ্রী চেয়েছিল নিজের স্বামী থাকবে ছোট সংসার মাটির উনুনে ধোঁয়া তোলা ভাতের থালা তুলে দিবে প্রিয়জনের হাতে। তাইতো বনশ্রী রবিদাশকে তাঁর হৃদয়ের গহীনে সুপ্ত বাসনার কথা বলে এভাবে- বনশ্রী: 'ক্যান। আমারে নিয়া সংসার করতে ইচ্ছে হয় না তোমার। আমার চুল দিয়া রোজ দুইবেলা পা মুছায়ে দেবো তোমার। সিঁথি ভরা সিন্দুর পরবো' (আলদীন, *কিত্তনখোলা* ১২০)। পুরুষ সমাজ বনশ্রীকে জীবন তরীর অতলে ঠেলে দেয় যেখান থেকে বনশ্রী চিরবাসের নৌকায় চড়ে স্বেচ্ছায় অতলে তলিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই নাটকে লাউয়া সম্প্রদায়ের ডালিমন চরিত্রের মধ্যেও ক্ষয়িষ্ণু নারী চরিত্রের হাহাকার বিবৃত হয়। ডালিমন বেদে পল্লীর মেয়ে নৌকায় জীবন বহমান। ডালিমনের জীবন নৌকা যে পাড়ে ভিড়েছে ভাগ্য জুটেছে অপমান, ভৎসনা, লাঞ্চনা। তাইতো সুখের খোঁজে ধাবিত হতো ভিন্ন ভিন্ন জীবন তরীর ঘাটে। এই ঘূর্ণায়মান ডালিমনের তরী এক সময় ঢেউয়ের তোড়ে তলিয়ে যায় কিংবা আবার ভেসে ওঠে। কিন্তু ডালিমন কোন চাওয়া পাওয়ার হিসাব মেলাতে পারেনা তাইতো আঁকড়ে বাঁচতে চায় মৃগরোগী সোনাইকে। সোনাই ভালোবাসার নেশায়

এবং না পাওয়ার বেদনায় ডালিমন অজানা, অনামা গন্তব্যে জীবন ভাসানোর প্রাক্কালে সোনাই ও ডালিমনের প্রেমাকো এভাবে সংসারে ধৃত হয়। কোনো সমে ভাবি নাই আবার আপনেরে দেখুম। এ কাইল ঠিক এই সমে আপনে আমার লাউয়া হইতে কইছিলেন। - অখন আমি লাউয়া। যদি লগে নিয়া যান। ডালিমন আইজ রাইত পোহাইলে নাও ভাসবো-আমার কতা ভুইলা যাবেন আপনে। ভুলবেন না। চোখের কোণ ভিজে উঠে ক্যান-মনে রাখলে কি হয় (আল দীন, *কীত্তনখোলা* ১৬৩)।

এই নাটকে ডালিমন চরিত্রের মাধ্যমে লাউয়া সম্প্রদায়ের সামগ্রিক জীবন উদ্ভাসিত হয়েছে। তার জীবন এখানে নিরর্থক, নেই কোন স্নেহ, মায়ার বাঁধন আছে শুধু হতাশা, সংকট এবং বাস্তব জীবন যুদ্ধে প্রতিনিয়ত টিকে থাকার প্রাণপণ লড়াই। প্রকৃত পক্ষেই এই নাট্যে লড়াকু দুই নারী বনশ্রী ও ডালিমন নিঃশোষিত ও জীবন যুদ্ধে পরাজিত, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। তাইতো বনশ্রী চলে যায় দূরলোকে, ডালিমন নৌকা ভাসায় সুদূরের পানে।

অন্যদিকে সেলিম আল দীনের 'কেরামতমঙ্গল' (১৯৮৮) নাটকটির কাহিনি 'কেরামত' চরিত্রটিকে ঘিরে আবর্তিত হলেও নাটকে উল্লেখিত নারী চরিত্র সমূহের বেদনা, যন্ত্রণা অবর্ণনীয় বলেই প্রতিভাত হয়। এই নাটকে শমলা, নওশাদী, নূরজাহান নারী ত্রয়ের যন্ত্রণা ক্লিষ্ট জীবনের পাশাপাশি এতে উঠে এসেছে হিন্দু, মুসলিম, আদিবাসী সম্প্রদায়, মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, রাজনীতি, সমাজচিত্র, সুবিধাভোগী নিপীড়িত মানুষের আত্মকথনের চিত্র। এই নাটকে এগারোটি (১১) দোজখের প্রসঙ্গ বিদ্যমান। কেরামত চরিত্র এক দোজখ থেকে উৎখাত হয়ে আরেক দোজখে প্রবেশ করে স্বর্গের সন্ধানে। কিন্তু শেষাবধি কেরামত কোন সুখ কিংবা সামাজিক স্থিতি আনতে সক্ষম হয় না বরং অন্যের অপরাধের দায়ে অন্ধত্ববরণ করতে বাধ্য হয়।

কেরামতমঙ্গল নাটকের তিন (৩) খন্ডে বিবৃত হয়েছে তিন নারীর চরিত্রের অনাগত ভ্রুন বিনষ্টের তীব্র আত্মত্মকথন। এই নওশাদী- চরিত্রের আবির্ভাব চন্দ্রকোনা খন্ডে, নূরজাহান-জলসুখা লঞ্চঘাট খন্ডে, শমলা-চানতারা খন্ডে লড়াকু জীবনের তীব্র বেদনা বিবৃত করেছে। নাটকের চন্দ্রকোনা খন্ডে ধৃত চরিত্র নওশাদীর বিয়ে হলেও সে সন্তান ধারণে অক্ষম বলে তাকে স্বামী গৃহ থেকে বিতাড়িত হতে হয়। ছোটবেলা থেকে অভাবের সংসারে বড় হয় নওশাদী, পিতা ভেবেছিল বিয়ের পর মেয়ে সুখের মুখ দেখবে কিন্তু ঘটে বিপরীত। নওশাদী শ্বশুর বাড়ী থেকে লাঞ্চিত হয়ে পিতৃগহে ফিরে এসে হয় পিতার চিরকালীন বোঝা। পিতা এক গ্রাম্য মাতবরের কটুচালে তালুকদারের বাড়িতে নওশাদীকে ঝিয়ের কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়। ঝিয়ের কাজে যেতে হবে জেনে নওশাদী স্বামীগৃহে ফিরে যাবার জন্য মাকে বলে: 'না বাইন্দালি করবার পারুম না। যদি হে মানুষ হুনে তাইলো যা কুনোদিন আমার দিকে ফিরা থুকও ফালাব না। হেরা যে পাষাণ গো। যে পাষাণ' (আল দীন, *কেরামতমঙ্গল* ২৪০)। পিতার কঠোর ও কঠিন সিদ্ধন্তে সাংসারিক দারিদ্রতা ঘুঁচাতে শেষাবধি তালুকদারের বাড়িতে কাজ করতে নওশাদী ছুটে যায়। নওশাদী 'বাঁজা নওশাদী' নামে তার গ্রামে পরিচিতি, আহা কী পরিহাস মাতৃত্বহীন নারীর। তবে তালুকদারের নগ্ন আর বিকৃত শক্তির কাছে পরাজিত নওশাদীর গর্ভে ভ্রুন আসে। তালুকদারের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে তাই পরবর্তীতে জোরপূর্বক ঔষধ সেবন বাধ্য করে ভ্রুন বিনষ্ট করা হয়। প্রবল মাতৃত্বের আকাঙ্খা ধ্বণিত হয় নওশাদীর আত্ম চিৎকারে বলে: আমার আতুর ঘর কোই তুষের মালসা কোই–সুর ভরা আযান ক্যা উডে না–ওইয্যা চন্দ্রকোনার হগল আতুর ঘরে দাইবুড়ি আহে নাচে গান গায় পোলা হইলে আযান দেয় (আল দীন, *কেরামতমঙ্গল* ২৪৩)। কিন্তু শেষাবধি নওশাদীকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে গ্রাম থেকে বিতাড়িত হতে হয়।

অন্যদিকে 'জলসুখ লঞ্চঘাট' খন্ডে উঠে এসেছে নির্যাতিত নুরজাহানের কথা। মুসলিম নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে পাকিস্তানি মিলিটারি তুলে নিয়ে বন্দী করে রাখে দীর্ঘ দিন এক সময়ে নুরজাহান গর্ভে ভ্রুনের অস্তিত্ব টের পায়। এমতাবস্থায় একদিন রাজাকার, কমান্ডার, মিলিটারি বাহিনীর জানোয়ারদের ধর্ষনের ফলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের

মৃত্যু ঘটে নুরজাহানের। এই অন্যায়ের দায়িত্ব নিতে পারেনি তার পরিবার কিংবা প্রতিবাদের 'কোন ফুরসতও মেলেনি তাদের। কারণ নূরজাহানের পরিবারের ছিল না কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব। নুরজাহান চরিত্রের নির্যাতন ও নিগৃহীত জীবন যাপনের চিত্র আমাদের সমাজে আজও বিদ্যমান। তবুও নুরজাহান স্বপ্ন দেখে অনাগত সন্তানের কিংবা একটি সুখকর সংসারের। তাইতো কেরামত যখন নুরজাহানের জীবন সংকটাপন্ন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বিবাহের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে, তখন বিবাহের স্বপ্নে বিভোর নুরজাহান বলে- "নুর: আহা এই রাইতখানা যদি না পোহাইতে গো" (আল দীন, *কেরামতমঙ্গল* ২৮৯)।

চাঁনতারা খণ্ডে দেখা যায় স্বামী গৃহে নির্যাতিত সমলাকে। শ্বশুরালয়ে শমলা পুকুর ঘাটে গোসলরত অবস্থায় একটি কানের দুল হারিয়ে ফেলে এই বিষয়টিকে ঘিরে শমলার উপর চলে অকথ্য অত্যাচার শুধু তা নয় ফলশ্রুতিতে বিবাহ বিচ্ছেদের মত চরম সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাবোধ করেনি স্বামী। শমলা স্বামী বিচ্ছেদের ধকল সইতে না পেরে অপ্রকৃতস্থ হয়ে যায়। এই সুযোগে বশির সাথে শমলা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যায় গর্ভে সন্তান আসে, সেই সন্তানও বিনষ্ট করা হয় চক্রান্ত করে। পরবর্তীতে স্বামী গৃহ ত্যাগের শোকে বার বার শমলাকে মৃদুস্বরে বলতে শোনা যায়।- শমলা: "না না মিছা কথা। তোমরা কুনো মানুষ আমার কষ্ট বুঝ না। বশইরা কান্দে কত যে কান্দে আমি কারোরে কবার পারি না। আ আমার দুলটা কো বাজান হেই হারা দুলটা" (আল দীন, *কেরামতমঙ্গল* ২৯৮)। এসকল দুঃখবোধ আওড়াতে আওড়াতে মনের অজান্তে সমলার উচ্চকিত ক্রন্দন অন্তরের বিদীর্ণকরা হাহাকার পাঠক হৃদয়কে শোকাতুর করে তোলে নিঃসন্দেহে।

অন্যদিকে সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষের নিত্যকার লড়াকু ও ক্ষয়িষ্ণু মানুষের জীবনকথন নিয়ে রচিত হাত হাদাই (১৯৮৯) নাটক। নাটকে অসংখ্য চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়, যারা কিনা খেটে খাওয়া নিত্য আহার যোগান দিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে বাস করেন। অজস্র চরিত্রের মধ্যে লড়াকু নারী চরিত্রটি দর্শক পাঠক মনকে আবেগাপ্লুত করে তোলে। নিত্য অভাবের সংসারে ছুক্কনীকে মাত্র পাঁচশত টাকার বিনিময়ে দুই সতীন থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বারের মত বিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে প্রতিদিন শুনতে হয়- চুক্কুনী: "আর বাপে মাত্র পাঁচশতগা টেঁয়া খাই বিয়া দিল মাঘ মাসের তেইশ তারিখে। মাঝির বেডা খেলাধন-যাই দেখি যে আল্লায় দিলে তার আগের বৌ আছে দুগা। ইগগার সান্নি–হরাদিন চেতি থাকে। আর ইগ্গা-পটের বিবি-খালি শাড়ি বদলায়। কয় ওই বান্দি- পানি আন-ওই বান্দি-মরিচ বাট" (আল দীন, *হাতহাদাই* ৮১)। চুক্কুনীর স্বামীগৃহ বিষাদে পরিণত হতে লাগলো তাই চুক্কুন্নী ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলে আসে নিজালয়ে। কিন্তু গ্রামের মানুষের কটুকথায় চুক্কুনী এবার নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। অবশেষে নানা পথ পরিক্রমায় চুক্কুনী বেশ্যা হতে বাধ্য হয়। চুক্কুনী কখনো এমন জীবনের প্রত্যাশী ছিল না। তার হৃদয়ে অন্তর্গত আবেগ এভাবেই-প্রকাশিত হয়েছিল আনার ভাণ্ডারীর সাথে কথা বলতে গিয়ে। চুক্কুনী: "ঘর। থুক থুক ঘরের মাইধে। হি হি হি-কি পাগল আমি-দাদা-গায় হলুইদের কতা মনে অইলে অনও বুক ধক ধক করি উডে। অনও দুই বিয়ার হাজনী শাড়ি ট্রাঙ্কে আছে। ন্যাপথালিন দি রাখি দিছি। যাতে তেইল্যাচোরায় ন কাডে" (আল দীন, *হাতহাদাই* ৮৩)।

চুক্কুনী আসন্ন ঝড় তুফান সঙ্গী করে যেভাবে স্বামী গৃহ ছেড়ে এসেছিল তেমনি গ্রামে এসে আনার ভাণ্ডারির কথায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে বলে- ছুক্কনী: দাদা–ধূলি উড়ের –ডর লাগে–তুফান ছুইটছে (আল দীন, *হাতহাদাই* ৮৩)। একথা বলে ছুক্কনী ছুটে চলে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ছুক্কনী মনের গহীনে ঘর সংসার ভাঙ্গার তুফানের প্রলয় ধ্বনি বেজে চলে যা ভুলে থাকতে চেয়েও পারেনি চুক্কুনী। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে চুক্কুনী অনাগত ভ্রুন সমেত ফিরে আসে একটু স্বত্ত্বির আশায় তার জন্মভূমে। এ যেন তুফানের প্রবল তোড়ে ভেসে আসা চুক্কুনী, ভগ্ন, রুগ্ন, স্বরে মায়ের নানান প্রশ্নের উত্তরে সে বলে চুক্কুনী: জোয়ারে ভাসি যে দেশে গেছি-সে দেশে খালি রাইক্ষস-

আগুনের 'লুয়া'' ধোঁয়া- গেলাসে গেলাসে রক্ত খায়। আখাউড়ার শামছু-বিছরা বজারের হাইঞ্জু কয়–থাক থাক রাজারাণী করি রাখুম তোরে। হঠাৎ চুক্কুনী চিৎকার দিয় উঠে। ওহ্ ওহ্। হীরে স্বর নামে প্রলম্বিত ও হ্ (আল দীন, *হাতহাদাই* ১৬৯)। এভাবে চুক্কুনী অনাগত ভ্রুন সমেত চলে যায় অজানা, অনামা গন্তব্যে। মৃত্যুর মুখোমুখি চুক্কুনী সংসারের আশায় স্বামী সুখের অদম্য চাওয়ায় সে দুই হাতে বিয়ের শাড়ি নিয়ে বলে- আছে আছে–গন্ধ আছে-সুখ আছে-রঙ আছে (আল দীন, *হাতহাদাই* ১৭০)। এখানে চুক্কুনী প্রতিনিয়ত প্রতিবাদী ও প্রতিরোধের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। নিত্যকার আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের হাহাকারে ভুবনময় ছুটে চলেছে কিন্তু সে স্থিত হতে সমর্থ হয়নি কিংবা তার ন্যায্য চাওয়াটুকু পূর্ণতা পায়নি।

সেলিম আল দীনের অনবদ্য সংযোজন নাটক 'যৈবতী কন্যার মন' (১৯৯৩)। এই নাটকে দুই নারী কালিন্দী ও পরীর জীবন কাহিনি গভীর ব্যঞ্জনায় বর্ণিত হয়েছে। কালিন্দী পর্বে বিধৃত হয় কালিন্দী কালো বলে বারংবার বিয়ে ভাঙ্গার দায় তার ঘাড়ে চাপে। এদিকে গায়েন পিতার দিনমান অভাবের সংসারে সে হয়ে যায় পরগাছা। উপায়ান্ত না পেয়ে পিতার সঙ্গে আসর থেকে আসরে গানে নাচে পালা গানের আসর মতিয়ে রাখে। এক সময় কালিন্দীর গায়েন পিতা তাকে বিয়ে দেবার নিমিত্তে বোনের বাড়িতে রেখে আসে সেখানে পরিচয় ঘটে মুসলমান গায়েন আলাল খাঁর। এরই মধ্যে কালিন্দী ও আলাল একে অপরের ভালবাসায় মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ে। বেশ কিছু দিন আসরে আসরে গান গেয়ে আলাল ও কালিন্দি দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। অপার ভালোবাসায় আলাল কালিন্দীকে নিয়ে গীত রচনার করে সেই গীত আসর থেকে আসরে দর্শক হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আলাল কালিন্দীর প্রেমে মুগদ্ধতয় বলে : কেউ মনসা, কেউ চন্ডী কেউ লক্ষী, স্বরস্বতী, গাজী- বদর। আমার খালি আপনে আছেন। সহসা কালিন্দীর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে, দু' হাতে পা জড়িয়ে ধরে প্রচন্ড আবেগে ঘষতে থাকে –"দুইটা চরণ গো কালিন্দী তোমার দুইটা চরণ–এই কাঙাল আলালের আর কিছু চাই না" (আল দীন, *যৈবতী কন্যা* ৩৮)।

হঠাৎ ভালোবাসার তুমুল ঢেউ বুকে নিয়ে উত্তাল কালিন্দী আলালের পানসীতে করে চলে যায় আলালের গৃহে। বেশ কিছু দিন আসরে আসরে গান গেয়ে আলাল কালিন্দীর সংসার জীবন মধুময় হয়ে উঠে ছিল। আলালের গীত আসর থেকে আসরে কালিন্দীর ভজনায় ভালোবাসায় কিছু সংখ্যক শ্রোতার মন জয় করে ঠিকই কিন্তু' অধিকাংশ শ্রোতার মনে হয়- "যে গানের মঙ্গল নাই, ইহকাল পরকালের ভালাই নাই সে গান দিয়া আমগরে কি"? (আল দীন, *যৈবতী কন্যা* ৫৬)

আলালের গানের আসর লাঠিয়াল বাহিনীর তোপের মুখে বন্ধ হয়ে যায়। লাঠির আঘাতে আহত হয়ে আলাল, বাঁচার জন্য পালিযে যেতে হয় আলাল- কালিন্দীকে। এর মধ্যে একদিন এক পীর আলালকে গানের আসর ছেড়ে দ্বীনের পথে আসতে বলে। এই ঘটনার পর একদিন আলাল উধাও হয়ে যায়। কালিন্দী খুঁজে ফিরে আলালকে হঠাৎ আলাল ভিন্ন বেশে ফিরে এলে কালিন্দী ভর সন্ধ্যায় মনের অজানা শঙ্কা উপেক্ষা করে আলালের কাছে জানতে চায়: "কোথায় গেছিলা" তখন আলাল বলে- "আমি পীরের মুরীদ হইছি। এ জনমের ভালোমন্দ থুয়ে আসছি হাতে" (আল দীন, *যৈবতী কন্যা* ৬৪)।

পীরের মুরিদ হয়ে কালিন্দীর প্রেমের নেশা থেকে আলাল নিজেকে বিযুক্ত করে কালিন্দী হয় আত্মঘাতী।এক সময় অসম্প্রদায়িক লোকবলের কাছে পরাজিত তার শিল্পী সত্ত্বা এবং কালিন্দীর প্রতি ভালোবাসা। কালিন্দী ও আলালের সংসারের ছিল সুখের আচ্ছাদন, অভাবের সংসারে ভালোবাসাই ছিল বেঁচে থাকার অবলম্বন। কিন্তু ধর্মের কাছে আলাল পরাজিত হয় এবং ছুঁড়ে ফেলে ভালোবাসার কালিন্দীকে। পিতৃগৃহ ছেড়ে যাকে আশ্রয় করেছিল তা থেকে প্রত্যাখ্যাত কালিন্দী মুখ থুবড়ে পড়ে। জীবনে নেমে আসে চরম হাহাকার বেদনার্ত কালিন্দী, আলালের তীব্র ভালোবাসার তান হৃদয়ে বিরূপ সুরে বেজে ওঠে, বুকের গহীনে প্রবল ভাঙ্গনের শব্দে আঁতকে উঠে কালিন্দী।

কালিন্দীর সেই ক্ষণে মনে হয় এই তো ঘুচলো তার চিরজীবনের সুখ। এতো দিনের আসরের ঢোল, খোল, মৃদঙ্গ, ঘুঙ্গুরের সুরধ্বনিতে যেন বিষাদের সুর। স্তব্দ নিশ্চুপ-কালিন্দী ভাবে একজনমে যে ঘর ছেড়ে এসেছে যাকে ভালবেসেছে, সে আজ পাপ পুণ্যের ঘোরে অস্বীকার করে কালিন্দীর গীতের আসর। কালিন্দী আলালের সঙ্গে এক ছোট্ট যে কুড়ে ঘরে সংসার বেধে ছিল সে এক চিলতে উঠোনে দুজনের গল্পে রাত কেটে ভোর হয়ে যেত, সেই উঠোনে বসে কালিন্দী ভাবে পিতৃগৃহে নয় অজানায় পাড়ী দিবে সে। কালিন্দী যেখানে গিয়েছে পুরুষের হিংস্র থাবা থেকে নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম হয়নি এটি জানা যায় কালিন্দীর নিম্নোক্ত সংলাপে: "সন্তান আসে, খসে যায় ভ্রূন। হে খোদা কতদিন সইব এসব" (আল দীন, *যৈবতী কন্যা* ৬৫)।

ভ্রুণ আসে কালিন্দীর, বিনষ্ট হয়। এভাবে কালিন্দী শেষ বারের মত ফিরে আসে পরম যত্নের ঘর আর আলালের ভালোবাসার কাছে নিঃস্ব-রিক্ত-রুগ্ন দেহে। কিন্তু আলাল পরিপূর্ণ পীরের ধ্যানে মগ্ন। কালিন্দীর ভালোবাসা ছিল নিখাদ আকঁড়ে থাকতে চেয়েছিল ভালোবাসার আলালকে। কিন্তু বাস্তব জীবন ও শিল্পী জীবন মেলাতে পারেনি বলে করবীর বীজ চূর্ণ করে খায় কলিন্দী।

নাট্যকার কালিন্দীর আত্মহননের একশত বছর পর পরী চরিত্রে মধ্যদিয়ে তুলে ধরেন বিক্ষুব্দ পরীর জীবন চিত্র। সংসারের অভাবের তাড়নায় যাত্রা দলে শিল্পীর জীবন বেছে নেয়, কিন্তু শিল্পী জীবনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে অজস্র স্বার্থপর ও দেহলোভী মানুষ ভীড় করে। দুই পর্বে রচিত নাটকে কালিন্দী বাস্তব ও শিল্পী জীবনের কোনটিতে আত্মতৃপ্ত করতে সমর্থ হয়নি। সেই কালিন্দীই পরী চরিত্রে পূর্ণবার মনোবাসনা পূর্ণ করতে এসে প্রবলতর ও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ায়। অর্থাৎ পরী পূর্ণবার পরাজিত হয় জীবন ও শিল্প বোধের কাছে। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের দুই নারীর জীবন কথায় দেখা যায় দুই কালের নারী সমাজে উপেক্ষিত, নিগৃহীত শুধু তা নয় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অবহেলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রোষের শিকার। যেখানে প্রতিনিয়ত নিজস্বতা বিসর্জিত হয়। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষেই নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক সমন্বয়হীনতার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

মূলত নিত্যকার জীবনের হিসাবে মেলাতে পারেনি বলে পরী ঘর ছেড়ে সুখের আশায় চলে যায় যাত্রাদলের আসরে। আসর থেকে আসরে শিল্পী জীবন ও বাস্তব জীবন তাকে চরম অতৃপ্তি আর অশান্তির দিকে ধাবিত করে। পরী চরিত্রের বর্ণনায় তেমনটি উদ্ভাসিত হয়। শিল্পী জীবন ও বাস্তব জীবন কোন জীবনে প্রশান্তি মেলে না পরীর। ভেবেছে শিল্পী জীবনই তাকে দুই জীবনের পূর্ণতা এনে দেবে। প্রকৃত পক্ষেই ঘটেছে কেবল দেহ বিনিময়ের বাণিজ্য। যা থেকে ভুলে থাকতে মদ্যপানে আসক্ত পরীর শরীরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর ভাবে-"আমার মনে হয়েছিল আসরের পাথে পথে একজন পরীর কোন স্বামী নাই, জনক জননী নাই, পুত্রকন্য নাই" (আল দীন, *যৈবতী কন্যা* ১৩১)। এত্তো সকল না পাওয়ার বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ করা কান্নায় ভিজিয়ে ফেলে পরীর বসন। ঝাপসা চোখে ভিড় করে শৈশব, কৈশরের সুশীতল গ্রাম, মা- বাবা, দিদি, গ্রামের গানের আসর, চৈতালী চাঁদ, নির্জন দুপুরে মায়ের বুকে মুখ ঘসে ঘসে ঘুমিয়ে যাওয়া আরও অজস্র পাওয়া নিয়ে পরী চলে যায় অনন্ত লোকে: পরী সেই ফুল কুড়ানোর দিন পেরুলে আসর শেষে মধ্যরাতে প্রচুর ধানী পান করে বনে চলে যায় (আল দীন, *যৈবতী কন্যা* ১৩১)।

অন্যদিকে পুত্র (২০০২) নাট্যে বর্ণিত হয়েছে লড়াকু নারী আবছার জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র। কিশোরী আবছা যমুনার চরে ঘুরে বেড়ায়, রৌদ্র ছায়ায় খেলা করে, কাশফুলের ঘন বনে হারিয়ে খুঁজে নিজেকে, শুধু তা নয় শরতের মেঘ বাদলের খেলা দেখে বিস্মিত হয় এমনকি ভরা যমুনার টলটলে জলে সাঁতারে বেড়ায়, ঠিক সেই বয়সে যমুনার অথৈ জলে নিমজ্জিত হয় মামা বাড়ি। আত্মীয় পরিজন বলতে শুরু করে 'আর পরিবারের সবাই বিশাল জাল থাবাহরণ করে নিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে: এ মেয়েটির ভেতরে এক অপয়া সুপয়া একত্রে বাস করে[১৯] প্রকৃত পক্ষে, যমুনা নদীর ভাঙ্গন আবছার যাপিত জীবন বারংবার বাধাগ্রস্থ করেছে। যে কোন ভাবে করেছে অসহায়,

স্থূলকুলহীন। এখানে বলা বাহুল্য যে, আবছা চরিত্র গতিময় যমুনার উদ্দাম হাওয়া ও উত্তাল ঢেউ। আবছা বিবাহের চির বিচ্ছেদে মামাকে বালে: 'আমার যে যমুনারে ভালো লাগে। সেই চর। সেই যে– তোমার পাছ পাছ– পান্তা ভাতের পাতিল নিয়া হাঁটু পানি কি নাওতে চরে গিয়ে বইসা থাকা। ফের ফির ফির‍্যা আসা (আল দীন, *পুত্র* ১৫)।

আবছা হয়তো সকল দুঃখ নিজের মধ্যে ধারণ করেছিল নিরবে নিশ্চুপে, নিভৃতে। কখনো চোখের টলটলে জলে ভুলে গিয়েছিল সকল দুঃখ। আবার নতুন প্রত্যয়ে দু'চোখে সুখের স্বপ্ন দেখেছিল। তাই তো ম্যাইটাল সিরাজের হাত ধরে চলে যায় আরেক অঞ্চলে। হয়তো সেখানে মিলবে নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয়। কিন্তু বিবাহের মধ্যে দিয়ে যমুনা নদীর সঙ্গে সদ্য বিবাহিত নারী আবছার বিচ্ছেদের সুর ভেসে আসে। আবছা কোন অজানা সুখের টানে পাড়ি দিয়েছিল দীর্ঘপথ অজানা অচেনা পথ, সে পথ বহুদূর। তবে যমুনার টলটলে জলের উত্তাল তরঙ্গ তার বুকে ঝড় তুলেছিল। আর প্রকাণ্ড ঢেউ যেন সঙ্গী হয়েছে যুমনাবতী আবছার। বিবাহের তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালীন নিস্তব্ধতায় আবছা শুতে পায়

যমুনার গর্জন। ভীত হয়ে আবছা বলে:''না না। ধরবা না আমারে। ঐ আসিতেছে ?

:কি

: ঐ যমুনাবতী। ভাঙ্গনের শব্দ শুনতেছি (আল দীন, *পুত্র* ২৯)।

আবছা বিবাহের দিন যমুনার পাড়ের স্নেহ ছায়ার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা শূন্যতায় হুহু করে কেঁদেছিল। তার আশ্রিত পরিজন চেয়েছিল কোন এক অজানায় হোক আবছার আশ্রয়। যেখানে সে সুখের সন্তরণে জীবন যাপন করবে। স্বামী সন্তান সুখে ভরে উঠবে সংসার। নিকানো উঠানে সন্ধ্যা সমীকরণ বসবে চাঁদের হাট। কিন্তু যমুনার করাল থাবা হিঁচড়ে ফেলে দিয়েছে আবছার অনাগত স্বপ্ন। পুত্রের অনন্ত লোক যাত্রায় তার সংসার কালো মেঘে ঢেকে যায়। যেন আবছার নিরেট বাড়িটি ধোঁয়ায় কুন্ডলিকৃত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও সর্বহারা আবছাকে বারংবার সিরাজ নানা কটুক্তিতে করুণ কণ্ঠে বলে: পুত্র খাগি। সতেরোটা বছর পার করতে দিলি না। লাথি মারি তর গর্ভ থলিরে। ক্যারে মাগী–তুইনা যমুইনার কূলে শ্যাষম্যাষ মামার ঘরখানা গাঙের খাওয়ায়া আসছস। না কিরে (আল দীন, *পুত্র* ৩২)।
এতো অপমান, অবজ্ঞা সইতে না পেরে নাড়ীর প্রগাঢ় উপলব্ধি নারী আবছাকে টেনে নিয়ে যায় যমুনা নদীর কাছে। পুত্রশোকে আবছা পুত্রের কবর চিহ্ন উপেক্ষা করে আজন্মের টানে যমুনার সঙ্গ অঙ্গীভূত করে। আবছা যমুনা নদীর ভয়াবহতা ভুলে আঁকড়ে ধরে নবজীবনের উদ্যেমে জীবনতরী ভাসিয়েছিলো। বিপদ সঙ্কুল যমুনা নদীর একূল অকূল সর্বত্র সাঁতরে বেড়িয়েছে, জীবনের অর্থ বোঝার নিমিত্ত। যখন যে পাড়ে গিয়েছে মুখ থুবড়ে ফিরে এসেছে। প্রবল ঘূর্ণিতে বিলীন হয়েছে প্রতিটি স্বপ্ন, কোন নদীর পাড় আঁকড়ে উঠে আসতে পারেনি আবছা। তাছাড়াও কোন প্রেমাবেগ কিংবা ভালবাসার পরম মমতা করেনি তাকে আলিঙ্গন। কিন্তু নদীর প্রতি অপার আবেগ শেষাবধি ঘূর্ণায়মান নদীর কাছে ফিরে যাওয়া হয়তো অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে আবছার অনাগত স্বপ্ন।

সেলিম আল দীন রচিত ভিন্ন ধাঁচের জীবনাচার নিয়ে রচিত নাটক বনপাংশুল (২০০৩)। এখানে বিপন্ন প্রায় মান্দাই জাতির বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি বিধৃত হয়েছে। যারা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার বাঙালি কমিউনিটি দ্বারা। অনেক সময় ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে চলতো উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র। তারপরও এই সম্প্রদায় পুণরায় বেঁচে থাকার স্বপ্নে লড়াই করে যায়। আদিবাসীদের মান্দাই সম্প্রদায়ের ধর্ম, সংস্কৃতি, নিত্যকার জীবন নির্বাহ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে আঁকড়ে থাকবার প্রচেষ্টা করছে তাই বিবৃত হয়েছে বনপাংশুল নাটকে। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য প্রান্তিক বা নিম্ন শ্রেণীর নারী চরিত্র বাল্য বিবাহিতা সুকি। মান্দাই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধি নিষেধ সুকীর প্রত্যহিক জীবন যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে এবং সুকীর জীবন হয়ে যায় বিভীষিকাময়। এ বিষয়ে গবেষক অরূণ সেন বলেন:" শিবের কচুনী এই আত্মলোপী পরিচয় সুকীর সুখ নেই, বিশ্বাস নেই রক্তমাংসের

মানুষের জন্যই তার কামনা বাসনা"। বনপাংশুল নাটক জুড়ে সুকি চরিত্রের পদচারণা। সমগ্র নাট্যে সুকির আশপাশে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা চরিত্রটিকে করে তুলেছে বিক্ষুব্ধও প্রতিবাদী। লড়াকু নারী সুকি মান্দাই নারীদের যেকোন অত্যাচার বঞ্চনায় পাশে থেকে প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নাট্যে সুকীর গর্ভেই আসে বাঙালিদের ধর্ষণের ফসল অনাগত সন্তান। এ বিষয়ে ড. লুৎফর রহমান বলেন- 'কৃত্য ও সংস্কারের নিগড়ে বাঁধা সুকীর পার্থিব চাওয়া, মানবিক আবেগ আকাঙ্ক্ষা এক অনকাঙ্ক্ষিত পথে পূর্ণতা পায়-সে ধর্ষিতা, গর্ভে বাঙালির ভ্রূন, মাতৃত্বে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিজাতীয় ভ্রূন নষ্ট করতে অনিচ্ছুক' (অরুন, কালের ভাস্কর ১৭০)।

বনপাংশুল নাট্যে শুধু সুকি নারী রূপে নির্যাতিতা কিংবা অবহেলিত নন এখানে' মঙ্গলি' চরিত্রটি সংসারের টানা পোড়েনে নিজেকেও স্থিত করতে সক্ষম হয়না। তার জীবন শিমুল তুলার মত উড়ে উড়ে ঘুরে ফিরে বাঙালির খদ্দরের কাছে সমর্পিত হয়। অভাবের তাড়নায় পরিবারের মা- বোনের অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে পারেনি বলে মঙ্গলি দেহ ব্যবসার দিকে ধাবিত হয়। মঙ্গলি বলে :"আর কি করতে পারতাম আমি মা বইনেরে বাঁচানের নিগা। কি করতে পারতাম" (আল দীন, *বনপাংশুল* ৩৪৯)।

সামগ্রিকভাবে নাটকসমূহ পর্যালোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্টত প্রতিয়মান হয় যে প্রত্যেকটি নাটকে নারী চরিত্রসমূহ উপেক্ষিত, অবহেলিত, নির্যাতিত। এই নারীদের একান্তই কাম্য ছিল সামাজিকভাবে আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা এবং একটি সুখকর, পরিশীলিত জীবন বোধে নিজেদের সমর্পিত করা। সেলিম আল দীনকৃত নাট্যে নারী চরিত্র সমূহ কখনো লড়াকু হয়ে ওঠে প্রতিরোধের নিমিত্ত, কখনো প্রচণ্ড শরীরী শক্তিতে করেছে তীক্ষ্ণ-তীব্র ভৎসনা কিংবা তীব্র গতিতে ছুটে গিয়েছে পাল্টা আঘাত করবার প্রত্যাশায় । কোন কোন নারী চরিত্র শূন্য, নিঃসাড়, নিরুত্তাপ দেহমনে নিশ্চল হয়ে যায় এই জীবনের সামগ্রিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাবে ব্যর্থ হয় কিংবা থেকে নিজেদের স্বেচ্ছায় বিযুক্ত করে এবং চির সৌন্দর্য্যের আবাহনে লীন হয়ে যায়। আবার কোন কোন নারী অপ্রকৃতস্থ কিংবা অবৈধ ভ্রূন সমেত ধুকে ধুকে দিক শূন্য, উদ্দেশ্যহীন সুখ হাতড়ে ফেরে। লড়াকু ও ক্ষয়িষ্ণু নারী চরিত্র সমূহের হৃদয়ের দহন যুগযুগান্তর এভাবে লেখকদের লেখনিতে হৃদয় নিংড়ানো আবেগ ভালোবাসায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেবলিই প্রত্যাশা নারীর অব্যক্ত বেদনা পাঠক ও দর্শকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হোক, নারী জীবন পূর্ণতর হোক।

তথ্যসূত্র

সেলিম আল দীন। *বাসন*। রচনা সমগ্র-৩। মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

সেলিম আল দীন। কিত্তনখোলা। রচনা সমগ্র-২। মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১।

সেলিম আল দীন। কেরামতমঙ্গল। রচনা সমগ্র-২। মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১।

সেলিম আল দীন। হাতহাদাই। রচনা সমগ্র-৩। মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

সেলিম আল দীন। যৈবতী কন্যার মন। হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৮।

সেলিম আল দীন। *পুত্র*। মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮।

সেন অরুন। *কালের ভাস্কর সেলিম আল দীন*। রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯।

সেলিম আল দীন, *বনপাংশুল*। রচনা সমগ্র-৫। মাওলা ব্রাদার্স, ২০১০।